আমি একটু রাত্রি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় গিয়া দেখি মামার সেই ঠাকুরদাদা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! মামাকে বলিতেছেন, "বলি একবারেই কি গোল্লায় গিয়েছো! চখের চামড়াটাও কি নাত-বৌয়ের পায়ে দিয়েছো! সুরেনের বাপ তোমাকে মানুষ করে' কাজ-কর্ম্ম করে' দিয়েছিলেন, তুমি তাঁর সম্বন্ধী তাই বুঝি তুমিও তেমনি নিজের সম্বন্ধীর কাজ করে' দিয়ে সে উপকারের শোধ দিলে! অতি উত্তম কার্য্য করেছো!" ব্রাহ্মণ উঠিয়া চলিয়া যান, সম্মুখে আমায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে বাবু, এ বাজারে ভাগ্নে হওয়ার কর্ম্ম নয়, পারিস তো আর জন্মে মামার দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ'য়ে উমেদারী করতে আসিস, এখন ঘরের ছেলে ঘরে যা।"

বৃদ্ধের বচন গ্রহণযোগ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। আমি এখনও সেই কলিকাতায় মামার বাসায় উমেদার!

বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই জন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কোন স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘ হ্রস্বের নিয়ম বাঙ্গলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চা-... ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তর-

ভূমির মত সর্ব্বত্র সমান। জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়। কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না। শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়। একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্ব্বেই অবিলম্বে আর একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

মন্দ পবন, কুঞ্জভবন,
কুসুম গন্ধমাধুরী।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুম কানন
ফুল পরিমল মাধুরী।

ইংরাজিতে অনেক সময় আট দশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।

বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্ব্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়ই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌঁছায় না। সেই

জন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোন লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বরপূর্ণ না হইলে সাধারণতঃ গ্রাহ্য হয় না।

বাঙ্গলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাঙ্গলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভাল ইংরাজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়-স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এই জন্য তাহাতে সর্ব্বত্রই একপ্রকার দুর্ব্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা পরিমাণে চীৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফল লাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। "যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" দুর্ব্বোধ হইতে পারে কিন্তু "সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়" দুর্ব্বল। "উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে" ইহার পরিবর্ত্তে "উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া" ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাঙ্গলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশতঃ বাঙ্গলায়

পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বার বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যত-ক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সঙ্গীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙ্গালী জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক, এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস, সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দ-নিহিত সঙ্গীতের লাঘব করে। কিন্তু "মনে রৈল সই মনের বেদনা। প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হল না" ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ সুতরাং সংস্কৃতে কাব্য রচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসান বাহুল্য।

...ক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু এ কথা ... যে সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা ... মাত্র গান, একেবারেই কাব্য ... করিয়া সুর শুনানই

হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাঙ্গলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাঙ্গলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

ভাসমান।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের সে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হচ্চে 'আইডিয়াল্' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাতপা নাড়া দেখ্‌তে পাই মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চল-
ফিরছে, যাচ্চে আস্‌চে, খুব একটা সমারোহ।
যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শক-
মাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্ত-
তাতে মনকে সর্ব্বদা বি-

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে' মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে' এস্থানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যবরণ দূর করে' অন্তরঙ্গ মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। তখন ভ্রম হয় ইংলণ্ডে পদার্পণ করবামাত্রই এই সব মানুষের সঙ্গে বুঝি পথে ঘাটে সম্মিলন হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরাজ, কেবল বিদেশী;—তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে' থাকে; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্লে 'ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে

থালের মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে' বলছিল "ভাই খাচ্চ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল! তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কি কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে! কিন্তু শরীর-গতিকে আজ আমার কোন ক্ষুধা বোধ হচ্চে না!" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে' লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চু-চালনা করে' ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্র-লেহন এবং ছুটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে' নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেই রকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজত থালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে' যেতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কি আছে শৃগাল তা ভাল করে' চক্ষেও দেখ্‌তে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যব-হার তার নিজের পক্ষে সুবিধা কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা এই জন্য ইংরাজ সমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণ সমক্ষে উদ্ঘাটিত

আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই চার কোঁটার স্বাদ মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারিনে। সর্ব্বজাতীয় ভোজ বল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও ক্ষুণ্ণ হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে', হাঁ করে' রাস্তায় ঘাটে পর্য্যটন করে', থিয়েটার দেখে', দোকান ঘুরে', কল-কারখানার তথ্য নির্ণয় করে'—এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে' আমার শ্রান্তি বোধ হয়েচে। কেবলমাত্র গতি, কোলাহল, সমারোহ অবস্থা-বিশেষে ভাল লাগতে পারে। যদি কখনো জীবন মনের নিতান্ত জড়ভাব উপস্থিত হয় তখন তাকে বাহিরের অবিশ্রাম আঘাতে সচেতন করে' ঈষৎ জীবনের উত্তাপ দান করতে পারা যায়। কিন্তু মন যখন সদা সচেতনভাবে কাজ করচে, চিন্তা করচে, ভালবাস্‌চে, তখন বাহিরের এই বিপরীত গোলযোগে তাকে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত করে' তোলে। বলা আবশ্যক, এই যে গোলযোগ এ কেবল আমাদেরই পক্ষে গোলযোগ, সেখানকার নেটিভদের পক্ষে নয়। সমুদ্রের যে গর্জ্জন সে কেবল সমুদ্র-তীরেই শোনা যায়, জলজন্তুরা বেশ নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করচে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেম্‌স্" জাহাজে একটা ক্যাবিন্ স্থির করে' আসা গেল। পর্শু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান;

এবং আর একজনের জিনিষপত্র একটি কোণে রাশীকৃত আছে। বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আ "বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস্।" বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে' ভ সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দে সঞ্চার হয় নি। ভাব্লুম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের রোে ঝল্সা এবং শুক্‌নো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেচে! যাদে মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ট নয় এইটুকু ক্যাবিনের মধে তাদের দুজনের স্থান সংকুলান্ হবে কি করে? গালে হাত দিয়ে বসে' এই কথা ভাবচি এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে শুভ প্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করচেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েচে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য্য উঠেচে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্য-তীর এবং ভেণ্ট্‌নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড় ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখ্‌ব তার যো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরাজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক সর্ব্বদাই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে' থাকে।

স্ত, এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলাতে আসে তখন স্বদেশের হরিণ-নয়নের কথাটা আর বড় মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই ক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েচে আর একসময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয়—ওটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল। যতক্ষণ দূরে আছি কোন বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরাজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে' অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত পরিষ্কার, হীরকের মত উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে, কিন্তু একটি মুগ্ধহৃদয়ের কথা বল্‌তে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণ নয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও কম দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজী সঙ্গীতকে পরিহাস করে' আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে' ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চ্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আর আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভাল লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্ব্বে-

কার কোন্‌ এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোন কোন পুরু যাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে একটা হচ্চে চৌকিতে পিন্‌ ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেম মজাও মনে হল না এবং সেইসকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদে স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখ যাচ্চে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন, তাতে ততটা সামাজিক নিন্দার কারণ হয় না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে ইংরাজ সমাজেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ আছে বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেচে। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মত মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময় সেটা ভালবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীক্ষ্ণ তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে' আপনার গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্য্য কারণ বশতঃ নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে' আনন্দ লাভ করেন। কার্য্যক্ষেত্রে যারা পরস্পর সমকক্ষ প্রতিযোগী সামাজিক আচারে ব্যবহারে তাদের মধ্যে সমান ভাবের ভদ্রতার নিয়ম থাকা আবশ্যক, কিন্তু যেখানে সেই প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্ব্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। এবং পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। স্ত্রীলোকের যে বল সে এক হিসাবে পুরুষেরই প্রদত্ত বল—মাধুর্য্যের কাছে আমরা স্বাধীন ভাবে আপন স্বাধীনতা

বিসর্জ্জন করি। অবলার দুর্ব্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েচে, এই জন্য যে পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং এই সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চ্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকের কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না—তারাই নির্ল্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজা, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বলে' প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্চে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে' পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফাষ্ট-ক্লাশে চড়ে' যাত্রা করচে আর কতকগুলি জড়সড় ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েচে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট এবং উদ্বর্ত্ত কেবল স্ত্রীলোকের এবং তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসঙ্কোচে গৌরব করে' থাকে এবং তার তিলমাত্র ইত স্তত হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে' জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্ব্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্ব্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না—তারা কেবল এইটুকু [মা]ত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল [মর্দ্দ]ন করবে, তাদের বদনে অন্ন যুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত [কলে]বরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চ্চার আয়োজন [করে] দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতা দেবে না, শীতের সময় গায়ে [কাপড়] দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার [সময় অনাহারে রয়ে গিয়ে] করে' থাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে

এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌বে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা পুরুষমানুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে' থাকে এবং পুরুষেরা আপনার বলিষ্ঠ উদার দুর্ব্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে' থাকে, যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্ম্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস থাকলে অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

স্বরলিপি।

বর্ষার দিনে। *

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

---

* 'মানসী' র এই কবিতাটির চতুর্থ শ্লোকটি সুরে বসান হয় ন
শ্লোকের সুর দ্বিতীয়টীরই অনুরূপ। সেই জন্য স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস!

আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

রাগিণী দেশ মল্লার—রূপক।

৩—৪+৩

।১´।২।০।

১ ২ ০
॥ ধা পধা মা। গা রা গা সা। রা রমা মা।
॥ এ ম ন। দি নে তা রে। ব লা যা
-া ॥

। -া -া -া -গমা। রা মা মা। পা পা পধা -া
। — — — য়। এ ম ন। ঘ ন ঘোর —

ক্র ... ... বৃ (মৃ)
। ঞা ধা ঞা। -া -া -া -া। ধা পধা মা
। ব রি ষা। — — — য়। এ ম ন

। গমা রা গা রসা। রা গমপা মপমগা। -মা -া -া -গমগা
। দি নে ম ন। খো লা যা। — — — য়

। রা মা মা। পা পা পা ধপা। মা পা পা। না না র্সা র্সা
। এ ম ন। মে ঘ স্ব রে। বা দ ল। ঝ র ঝ রে

। না র্সর্রা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা। মা ধঞধা পধপা
। ত প ন। হী ন ঘ ন। ত ম সা

(মৃ)

। -া -া -া -া॥ সা সা সা। সা সা সা সা। সা ন্সরা রা।
। — — — য়॥ সে ক থা। শু নি বে না। কে হ আ।

। -া -া -া -া। রা রা রা। রা -া ন্া সা। রা সরগা গা।
। — — — র,। নি ভৃ ত। নি — র্জ ন। চা রি ধা।

। -া -া -া -া। গা গা মা। মা পা পা ধপা। মা পা পা।
। — — — র,। দু জ নে। মু খো মু খি। গ ভী র।

। ধা ধা ঞা ঞধা। পা ধা পধা। মা মগা রা গরা।
। দু খে দু খী। আ কা শে। জ ল ঝ রে।

। সা গমগা রগরা। -া -া -া -া। গা রগরা সা। সা সা ন্া ন্সা।
। অ নি বা। — — — র। জ গ তে। কে হ যে ন।

। ধ্ন্া ধ্ন্সা সা। -া -া -া -া। মা পা পর্সা। না -া না না।
। না হি আ। — — — র। স মা জ। সং — সা র।

ক্র … … … … … …

। নর্সা ধনর্সা র্সা। -া -া -া -া। নর্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা।
। মি ছে স। — — — ব,। মি ছে এ। জী ব নে র।

… … … … … … … … বৃ (মৃ)

। র্সা নর্সর্রা র্সর্রা। -া -া -া -া। র্সা নর্রা র্সা।
। ক ল র। — — — ব,। কে ব লি।

। ঞা ঞধা পা ধপা। মা পধা পা। মা গমগা রা রা।
। আঁ খি দি য়ে। আঁ খি র। সু ধা পি য়ে।

। রপা মা মা। গমগা রা গরা সা। রা রমগা রগরা।
। হৃ দ য়। দি য়ে হৃ দি। অ নু ভ।

। -া -া -া -া। গা রগরা সা। সা সা ন্া ন্সা। ধ্ন্া ধ্ন্সা সা।
। — — — ব,। আঁ ধা রে। মি শে গে ছে। আ র ব।

। -া -া -া -া। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা।
। — — — ব। তা হা তে। এ জ গ তে। ক্ষ তি কা।

। -া -া -া -া। ধা র্সা নর্সা। ধা ধা পা পঃধপঃ।
। — — — র,। না মা তে। পা রি য দি।

। মা মগা মপমগা। মা -া -া-গমগা। রা রপা পা।
। ম ন ভা—। — — — র। এ ক দা।

। মা গমগা রা গরা। সা রগা রগা। সা সরা ন্া সা।
। গৃ হ কো ণে। শ্রা ব ণ। ব রি ষ ণে,।

। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা। -া -া -া -া।
। দু ক থা। ব লি য দি। কা ছে তা। — — — র,।

। ধা র্সা নর্সা। ধা ধঞধা পা পধা। মা মগা মপমগা।
। তা হা তে। আ গে যা বে। কি বা কা।

(ব)

। মা -া -া -া। মা পা পর্সা। না না না না। নর্সা ধনর্সা র্সা।
। — — — র। ব্যা কু ল। বে গে আ জি। ব হে বা।

ক্র ... ...

। -া -া -া -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা। নর্সা নর্সর্রা র্সর্রা।
। — — — য়,। বি জু লি। থে কে থে কে। চ ম কা।

... ... বৃ (মৃ)

। -া -া -া -া। র্সা নর্সর্রা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা।
। — — — য়। যে ক থা। এ জী ব নে।

। মা পধা পা। মা মগা রগা সা। রমা মা মা।
। র হি য়া। গে ল ম নে। সে ক থা।

। গমগা রা গরা সা। রা রমগা রগরা। -া -া -া -া।
। আ জি যে ন। ব লা যা। — — — য়।

ক্র ... ...
। র্রা ম্মা মা। পা পা মপধা -া। ঞা ধা ঞা।
। এ ম ন। ঘ ন ঘো র। ব রি ষা।

... ... বৃ ক্র ... ... মৃ
। -া ধঞর্সা ঞর্সঞধা ঞা ॥
। — — — য় ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) স, র, গ, ম, প, ধ, ন, এই সপ্ত স্বর।

(২) স, র, গ, প্রভৃতি স্বরাক্ষরে আকার যোগ করিলেই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। ঃ=অর্দ্ধমাত্রা; যথা স্বরলিপির ১৯ পংক্তিতে পঃ ধপঃ; অর্থাৎ পঃ অর্দ্ধমাত্রা ও ধপঃ একত্রে অর্দ্ধ-মাত্রা; পঃ ও ধপঃ মিলিয়া এক মাত্রা; বলা বাহুল্য "ধপঃ"-র ধ ও প প্রত্যেকে কাজেই সিকিমাত্রা।

(৩) ঞ=কোমল ন।

(৪) উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্ ও খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

(৫) পার্শ্বের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন—ফিরিয়া গিয়া যেখানে একেবারে থামিতে হইবে কিম্বা অন্য কলি ধরিতে হইবে তাহার শিরোদেশে যুগল-ছেদ বসে। অন্য কলি ধরিবার সময় কখন কখন আস্থায়ীর শেষ স্বরের একটু পরিবর্ত্তন হয়—সেই পরিবর্ত্তিত স্বর শিরোদেশে বসান হয়। যথা, দ্বিতীয় পংক্তির "-গমা"র উপরে "-া" বসিয়াছে। অর্থাৎ "গমা"র পরি-বর্ত্তে "ম"-এর টান্‌টিই চলিবে।

(৬) রূপক তালটি অযুগ্মমাত্রিক; প্রতি তাল-বিভাগে এক-বার তিন মাত্রা, একবার চার মাত্রা করিয়া পর্য্যায় ক্রমে আসে; তাই ৩-৪।৩ এই তালাঙ্ক চিহ্নে ৩-৪ এইরূপ লেখা আছে; ।- র ডাহিন দিকে যে ৩ লেখা আছে তাহার অর্থ এই;—১, ২, ৩ খুব দ্রুত উচ্চারণ করিলে যতটা সময় লাগে এই গানের প্রত্যেক মাত্রা ততটা কাল স্থায়ী। এই পদ্ধতি অনুসারে, কতটা "বিলম্ব" কতটা "দ্রুত" তাহা যথাযথরূপে ব্যক্ত হয়।

(৭) ক্র-বৃ অর্থাৎ ধ্বনির ক্রমশঃ বৃদ্ধি; ক্র-মৃ = ক্রমশঃ মৃদু, ব = সবলে; মৃ = মৃদুভাবে। এই অলঙ্কার-চিহ্ন শিরোদেশে প্রয়োগ হয়।

জীবিত ও মৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হাটের জমিদার শারদাশঙ্কর বাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির তৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি ছিল। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না;—তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবী নাই কেবল স্নেহের দাবী—কিন্তু কেবলমাত্র সেই সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোট ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কি কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে এই জন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ,বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছুই নাই। পূর্ব্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে; সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"যাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানের সেই কুটীরে গিয়া

উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে, কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—“দিদি”—অন্ধকার

ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় যা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্‌লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখের পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং দূরস্থ তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে

পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃত-দেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূত-পূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্য-ক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয়

তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়। সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল। পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত

ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক-দণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকট-বর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দো-বস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুর-বাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব!"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিক-

ক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল, যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ, অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কি উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল?

আবার আর এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিক্‌কে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এই জন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক একদিন চীৎকার করিয়া উঠিত—এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন তখন যেখানে সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্দ্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল—"দিদি, দিদি, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো! আমাকে এক্‌লা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল—"হাঁ

গা, তুমি কেমনধারা লোক ! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুর-ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না ! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝাইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে !”

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি !—এই বলিয়া তিনি কোনরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণিহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না! লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখি!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়াকপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন! তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি—আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর কোন স্থান গড়িয়া রাখেন নি তখন কাজে কাজেই, বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই!"

এম্‌নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল, যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি নিশিন্দাপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল!" শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড়ে পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে!"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনিনা, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি শুনিতে কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"—

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না। উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে। একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম!" আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!" অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।" ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল—"সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি!"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শ্রীপতির বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করিয়াছি! আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব!" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওগো, আমি তবে কোথায় যাব!"—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্ব-জগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া নিশিন্দাপুরে ফিরিয়া গেল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল। বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া

পন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে, একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, জল দে!"—আ মরিয়া যাই! সোনা আমার তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস্ নাই! তাড়া-

তাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উ তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল। যতক্ষণ ঘুমে ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"—কাকিমা কহিল "হাঁ খোকা!" "আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?" ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, তুই যা!"—কাদম্বিনী আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই।—সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল,খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই। ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি!"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন "ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!"—তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!" বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন বলিল "এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!" শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল,দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল! তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

লোক-চেনা।

ইতিপূর্ব্বে "বালক"-পত্রিকায় মুখ-চেনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। কিন্তু মুখ-চেনা অপেক্ষা লোক-চেনা আরও ব্যাপক; ইহার মধ্যে মুখচেনা, মাথা-চেনা, আকৃতি-চেনা, প্রকৃতি-চেনা সকলই আইসে। আমরা সকলেই একটু না একটু লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়া থাকি—কখনও চিনিতে পারি, কখনও বা ভুল করি। অধিক স্থলেই আমরা মোটামুটি একরকম চিনিতে পারি। একজন লোককে প্রথম দেখিবামাত্রই তাহার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা আমাদের মনোমধ্যে স্বতই উদয় হয়; এই ধারণা সকল সময়েই যে ঠিক্ হয় একথা বলা যায় না। লোকের সহিত যাহার যত বেশি ব্যবহার, লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যার যত বেশি, তার সেই পরিমাণে লোক-চেনায় কম ভুল হয়। লোকের সহিত ব্যবহার থাকিলেই যে সকলের লোক চিনিবার শক্তি হয় তাহাও নহে। কেহ কেহ চিরজীবন লোকের সহিত ব্যবহার করিয়াও লোক চিনিতে পারে না—কেহবা স্বভাবতই লোক চিনিতে পটু। লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখি এখনও লোকচরিত্র-বিদ্যা অসম্পূর্ণ—এখনও উহা বিজ্ঞানের সামিলে আসে নাই। সেই জন্য তাহাদের সব কথাই যে বেদ-বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। নিয়মগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-ক্ষেত্রে মিলাইয়া দেখিবেন—ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্ অন্তত সব জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার একটা অভ্যাস জন্মিবে—পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হইবে। য়ুরোপীয়-

দিগের তুলনায় আমাদের এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি কম। আমরা বাহিরের সকল জিনিসই যেন চোখ বুজিয়া দেখি,—বহির্দৃষ্টি আমাদের নাই বলিলেই হয়, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিই প্রবল। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ আচার্য্যেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ঠিক না হইলেও তাঁহাদের বিবৃত মূলতত্ত্ব যে অকাট্য সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের একটি মূল কথা এই—"যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি; যেমন প্রকৃতি তেমনি আকৃতি।" একজন কুস্তিগির পালোয়ানকে দেখ—আর একজন টুলো ভট্টাচার্য্যকে দেখ—উহাদের আকৃতি দেখিবামাত্র উহাদের প্রকৃতি একেবারেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আর একটি মূল কথা এই, ব্যক্তি-বিশেষ বা জীববিশেষের যেরূপ দেহের আকার তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও প্রত্যেক অংশও সেই দেহের অনুযায়ী—সমস্তের সহিত প্রত্যেক অংশের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একজনের কেবল হাতের তেলো দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার সমস্ত দেহের প্রকৃতি কিরূপ। Agassiez প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূস্তর-নিহিত একটি অস্থিখণ্ড দেখিয়াই বলিতে পারেন, সে অস্থিটি কোন্ শ্রেণীয় জীবের। লোক-চেনার উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশি কথা বলা অনাবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, আদালতে, বর-কন্যা-নির্ব্বাচনে, কর্ম্মচারী-নিয়োগে লোক-চেনা যে বিশেষ কাজে আইসে তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব আর বেশি বাক্যব্যয় না করিয়া আসল কথায় আসা যাক্।

একজন লোককে দেখিবামাত্র প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার দৈহিক প্রকৃতি কিরূপ, দৈহিক প্রকৃতির অবস্থা জানিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। আমাদের আয়ু-

র্ব্বেদে তিন প্রকার দৈহিক ধাতুর উল্লেখ আছে—বাত, পিত্ত ও কফ। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য তাহার বায়ু-প্রকৃতি, যাহার শ্লেষ্মা বা কফের প্রাধান্য তাহার কফ-প্রকৃতি, যাহার পিত্তের প্রধান্ত তাহার পিত্ত-প্রকৃতি। পুরাতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কতকটা এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। আমরা যাহাকে বায়ু-প্রকৃতি বলি, তাঁহারা তাঁহাকে স্নায়ু-প্রকৃতি বলিতেন আমরা যাহাকে কফ-প্রকৃতি বলি তাঁহারা তাহাকে লিম্ফ্যাটিক্ অর্থাৎ রস-প্রকৃতি বলিতেন—কিন্তু পৈত্তিক প্রকৃতির নামকরণে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আমাদের যা তাঁহাদেরও তাই। তবে, তাঁহাদের আর একটি শ্রেণী বেশি ছিল—তাহা রক্ত-প্রকৃতি। আধুনিক শিরোতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আবার ইহাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাহা এই—(১) মনোময়ী প্রকৃতি; (২) প্রাণময়ী প্রকৃতি (৩) বলময়ী প্রকৃতি। প্রাণময়ী প্রকৃতির অন্তর্গত রক্তময়ী ও রস-ময়ী প্রকৃতি। যাহাদিগের দেহে অস্থি ও পেশীতন্ত্রের প্রাবল্য তাহাদিগেরই বলময়ী প্রকৃতি। পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে হাই-লাণ্ডীয় স্কট ও সুইস্‌জাতি এই লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের পাঠান আফ্‌গান ও শিখদিগেরও বলময়ী প্রকৃতির প্রধান্ত। এই প্রকৃতির লোকদিগের মোটা মোটা হাড়, পাকানো পাকানো দৃঢ় পেশী—ইহাতে করিয়া শরীর বলবান ও কষ্টসহ হয়। যাহাদিগের বলময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদিগের স্বভাবও প্রবল; তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ; কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহারাই নেতা। চিন্তাশীলতা অপেক্ষা তাহাদিগের দর্শন-পরতা অধিক। চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণ যে কার্য্যোপায়-প্রণালী স্থির করেন, এই প্রকৃ-

তি লোকেরা তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। তাহারা উদ্ধত ও ভুম্বাকাঙ্খী; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সকল জাতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহারা অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। বলময়ী প্রকৃতির আবার দুই প্রকার ধাঁচা আছে—এক পেশীময়ী—আর এক অস্থিময়ী। যে শরীরে অস্থির প্রাবল্য—অথচ পেশী কম, তাহাদিগের গঠন-রেখা কোণ-বিশিষ্ট ও খোঁচাল—তাহারা বড়ই অলস; তাহাদিগকে শীঘ্র চাগান যায় না, কিন্তু একবার চাগাইয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের আবার থামানো যায় না। এই ধাঁচার লোকদিগের কাজ-কর্ম্ম, চলা-ফেরা বড়ই অশোভন ও অনিপুণ, ইহাদের রকম-সকমও বর্ব্বরের ন্যায়। অস্থি ও পেশীর যখন সামঞ্জস্য হয় তখনই বলের সহিত শোভনতা ও পটুতা মিলিত হয়, তখনই বলময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়।

যাহাদিগের দেহে পুষ্টি-তন্ত্রের প্রাধান্য—অর্থাৎ পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্ত-পরিচালন যন্ত্রসকল অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগেরই প্রাণময়ী প্রকৃতি। যাহাদের বক্ষদেশ প্রশস্ত, যাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্তচালন যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগকে রক্ত-প্রকৃতি বলা যায়। তাহারা একটুতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে ও সর্ব্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তাহারা যেরূপ চিরোৎফুল্ল ও দৈহিক স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাহাতে অতিরিক্তমাত্রায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দিকে তাহাদিগের ঝোঁক থাকা অসম্ভব নহে।

যাহাদের ঔদরিক যন্ত্র সকল বেশি কার্য্যকরী, তাহারা রসময়ী প্রকৃতির লোক—তাহারা লম্বোদর, নাদুস্-নুদুস্ ও গোলগাল; তাহাদিগের রক্ত-চালনা ঢিমা-চালে সম্পন্ন হয়—তাহাদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও মন্দীভূত, ক্ষীণ ও আলস্য-জড়িত। এই প্রকৃতির

লোকদের না আছে মনের বল, না আছে শরীরের বল। ইহা নিদ্রালু, অলস, ও উদর-পরায়ণ—রোগ দ্বারা ইহারা শীঘ্র আক্রান্ত হয়। কিন্তু রক্তময়ী ও রসময়ী প্রকৃতির যদি সামঞ্জস্য হয় অর্থাৎ বক্ষ ও উদর এই উভয় প্রদেশেরই যন্ত্রগুলি যদি যথা-নিয়মে কার্য্য করে তাহা হইলে প্রাণময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়—শরীর স্বাস্থ্য ও বলের বৃদ্ধি হয়। ভৌতিকের দিকে একটু বেশি টান হয় বটে—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও একটু বেশি সক্রিয় হইয়া উঠে সত্য—কিন্তু ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত বৃত্তির সংযোগ থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বেশি মাথা তুলিতে পারে না। যাহাদের প্রাণময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদের শারীরিক উদ্যমের কাজ ভাল লাগে ও তাহাদের মানসিক ক্রিয়া সকলও সহজ ও বহুপথগামিনী; দৃঢ়তা অপেক্ষা তাহাদিগের মনের স্থিতিস্থাপকতা সমধিক। ইহারা যতটা পরিশ্রমী ততটা অবিরতচেষ্ট নহে অর্থাৎ কোন বিষয় সংসাধনের জন্য ইহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে পারে না। ইহারা চট্ করিয়া একটা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে, ইহাদের কল্পনা তেজস্বিনী, নিজ মনের ভাবও ইহারা শীঘ্র ও সহজে প্রকাশ করিতে পারে—কিন্তু ইহাদের গভীরতা অপেক্ষা চটক্ বেশি। এক বিষয়ে ইহারা অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না—কারণ, ইহারা বৈচিত্র্য ভালবাসে। ইহাদের রিপুবেগ প্রবল কিন্তু কোনও ভাবই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না—সর্ব্বদাই মেজাজের পরিবর্ত্তন হয়। ইহারা প্রফুল্ল, উচ্ছ্বাসময়, খোলা-প্রাণ, প্রিয়-দর্শন; ইহারা উপাদেয় আহারাভিলাষী, আরাম ও আয়েসের অনুরাগী। বল-প্রকৃতি লোক অপেক্ষা ইহারা সহজে কুপথগামী হইতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির শাসনাধীনে থাকিতে পারিলে এই প্রকৃতির লোকেরা বড় সুখী হয়। যেমন নিজে

যাঁহারা মনোময়ী
া প্রশস্ত ও উন্নত—
ার। তাঁহাদের মুখ
হইয়া মুখ ক্রমশঃ সরু
াব ও ভাষা সমুন্নত ও সুরুচি-
্য, মলিন ও ইতর তৎপ্রতি তাঁহারা
াঁহারা হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করেন তাহা
ুস্পষ্ট ও সুতীব্র এবং তাঁহাদের ধারণা ও কল্পনা
ক্রতগতি; তাঁহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় যতটা সুখানুভব করেন অন্য প্রকৃতির লোক ততটা করে না। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের অনুশীলনে তাঁহারা অধিক রত। সাহিত্য, কবিতা, চারুশিল্প তাঁহাদিগের সাধের জিনিস।

মন প্রাণ বল এই ধাতুত্রয়ের এক একটি কাহারও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাই এতক্ষণ বর্ণনা করা হইল; কিন্তু আসলে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে দেখা যায় না; প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিতে এই তিন ধাতু বিমিশ্র ভাবে থাকে—কাহারও কোনটা কম কাহারও কোনটা বেশি। এই ধাতুত্রয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য অতি বিরল; তবে কাহারও কাহারও প্রকৃতি, সামঞ্জস্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর। এই ধাতুত্রয় তাহাদের প্রকৃতিতে এরূপ ভাবে মিশ্রিত থাকে যে বুঝা দুর্ঘট উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় তিনটির মধ্যে দুইটি প্রবল ও একটি ক্ষীণতর; এই ধাতুত্রয়ের বিভিন্ন সমাবেশ অনুসারে কাহারও বা মনোপ্রাণময় প্রকৃতি কাহারও বা বলপ্রাণময় প্রকৃতি—কাহারও বা মনোবলময় প্রকৃতি—এরূপ নানাপ্রকার

মিশ্র প্রকৃতি উৎপ
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ আ
হইয়া পড়ে। মোট কথ
শ্যক যাহাকে চিনিতে চেষ্ট
মোটামুটি তাহার প্রকৃতি জা
অবয়বাদি পর্য্যালোচনা করা আবশ্য

সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ।

একটা জিনিষ যথার্থ কি অর্থাৎ সেটা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা' নির্ণয় করতে গেলে, তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে' দেখে' তার স্বরূপগত গুণ থেকে তার অবস্থাঘটিত গুণগুলো বিচ্ছিন্ন করে' দেখা আবশ্যক। সাহিত্য কি তা স্থির করতে গেলে তাকে ভিন্ন অবস্থায় দেখে বেছে নিতে হবে, তার কোন্ গুণগুলি নিত্য এবং কোন্ গুণগুলি ক্ষণিক। যদি কোন লেখার এমন কোন গুণ পাই যার অভাবেও আমরা তাকে সাহিত্য বলে' গণ্য করতে পারতুম তবে তাকে সাহিত্যের স্বরূপগত গুণ বলা যেতে পারে না। তুমি যাকে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের সম্বন্ধতত্ত্ব বল্‌চ সেই গুণটি সব সময়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় কি না এটা দেখ্‌লে আমাদের মীমাংসার অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

আমি লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন সাহিত্য বিশেষ কিছু জানিনে তাই এ বিষয়ে জোর করে' কিছু মতামত দিতে পারচিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই মূলতত্ত্বটি একটি আধু-

নিক সৃষ্টি। পুরাতন সাহিত্যে ছিল কি না সন্দেহ, আর যদি বা থাকে আজকালকার চেয়ে ঢের কম।

অবশ্য আমি এমন কথা বল্‌তে চাইনে যে সাহিত্যের খুব আদিম সময়েও এই মূলতত্ত্ব একেবারে ছিল না। কেননা সমাজ ব্যতীত সাহিত্যের সম্ভব নয়, আর সমাজের ভিত্তিই হচ্চে নীতি—এবং নীতির মূল হচ্চে এই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান। এমন কি আমরা চখে যখন কোন জিনিষ দেখি তদ্দ্বারাও বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তর্প্রকৃতির একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই হিসাবে তুমি যদি বল যে সাহিত্যের মধ্যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক তাহলে ও-বিষয়ে আমার বিশেষ কোন কথা নাই—কেন না মানুষের প্রত্যেক কার্য্যে এবং চিন্তায় সেই মূলতত্ত্ব অবলম্বন থাকা চাই। চিন্তার অর্থই মনের সহিত অ-মনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বলে' একটা বিশেষ উল্লেখ করতে গেলে এই সাধারণ মূলতত্ত্ব ছাড়াও আর একটা কিছু মনে উদয় হয়।

এই জিনিষটা ঠিক্‌টি কি তা বোঝানো শক্ত কিন্তু আজকা কার প্রধান কবিদের লেখা পড়লে অনেকটা পরিষ্কার হয়। শে বল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই বল, টেনিসন্‌ই বল, এমন কি বায়রণও, এ সকলেই আমি কি এবং এই জগতের মধ্যে আমার স্থান কোথ সৌন্দর্য্য ভালবাসা ইত্যাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ভাবটা নিয়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই ব্যতিব ভাবটাকেই তুমি বোধ হয় মূলতত্ত্ব হিসাবে ধরচ। এ ভাব কিন্তু আজকালই দেখা যায়। পুরাকালে সাহিত্যকারগণ আ দের চখের সামনে সুন্দর ছবি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন—ক গ্রীক সাহিত্য যতদূর দেখেছি তাদের লেখার সঙ্গে

চনার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমার বোধ হয় সংস্কৃত াহিত্যেও এইরূপ সরলভাবে সৌন্দর্য্যবিকাশের প্রতিই লক্ষ্য ছল। আজকাল কিন্তু আমরা কিছু বেশি বিশ্লেষণের পক্ষপাতী য়ে পড়েছি। আমাদের দার্শনিক ভায়াদের উপদ্রবে আমরা সৌন্দর্য্যকে সুন্দর ভাবে দেখে' তৃপ্তি লাভ না করে' তার বুক চরে তার কঙ্কাল বাহির করি। এর একটা কারণ হচ্চে আজকাল আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে এসেচে। তার সঙ্গে খানিকটা সন্দেহ মিশে গেছে। তাতেই কিন্তু বিশ্বাসের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দিয়েচে। বিশ্বাসকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হচ্চে বলে তার অস্তিত্বটা সকলের কাছে প্রবলরূপে প্রতীয়মান হচ্চে।

একহিসাবে কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যে সেই সময়ের মূলতত্ত্ব বং লেখকের নিজের মূলতত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পাবেই। নুষ বর্ণনা করতে গেলেই তাকে সমাজের অঙ্গীভূত রকমে না করতে হবে। সুতরাং কি ভিত্তির উপর সে সমাজ স্থাপিত ং তখনকার কি আইডিয়াল্ তা কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত ব। লেখকও তার নিজের আইডিয়াল নিজের বিশ্বাস নিজের তত্ত্ব তার মধ্যে খানিকটা প্রকাশ না করে' থাকতে পারে না। জন্যই এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের দর্পণ। আজ- ল আমাদের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করবার একটা চেষ্টা আছে তাই যুগের সাহিত্য থেকে ইহাকে সংশয়াপন্ন এবং অন্তর্দর্শনশীল ল বলে' আমরা জান্‌তে পারি। এই হিসাবে এক এক যুগের হিত্য সেই সেই যুগের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে।

ন্ত যদিও এই মূলতত্ত্ব প্রকাশ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী সাহিত্যের স্বরূপগত বলা যেতে পারে না। মনে

আমি এমন সুনিপুণ সাহিত্য-জালিয়াৎ যে আমি এই উন-
শতাব্দীতে বসে' মহাভারতের সময়ের একটা বিষয় নিয়ে
মহাভারতের লেখার মতন মহাকাব্য লিখতে পারতুম। তাকে
না সাহিত্য বল্‌বে? অথচ এর মধ্যে কি মূলতত্ত্ব রইল?
আমার নিজের নিজত্ব রইল না—থাক্‌লে সেটা দূষণীয়—আর
লেখকের সমসাময়িক মূলতত্ত্ব তাও তাতে নাই—যদি কিছু থাকে
তবে সেটা প্রাচীনকালের মূলতত্ত্ব।

আমি তোমাকে অনেক রকম উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার
চেষ্টায় আছি যে নিজের নিজত্ব কিম্বা রচনাকালীন সময়ের বিশে-
ষত্ব প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে স্বরূপগত আবশ্যকীয় নয়।

ঠাকুরঘর।

বড় ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা
গায়ে পাতিয়া লয়। বিশেষতঃ যদি ছুটো অপবাদের কথা
থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে সকলেই মনে
করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভারি খুসি
হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর
মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার
প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে—নতুবা এমন লোক আর
কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহঙ্কারের উপর স্বভাবতই ছুটো শক্ত কথা
বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে ত খুসি
হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই ছই দশজন নয়

একেবারে দেশের লোকে তাড়া করিয়া আসে। ইহার কি ?

তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া ক খাইতেছি ? অর্থাৎ যেটা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া উচি গোপনে তাহার মধ্য হইতে উপাদেয় জিনিষটি লইয়া নিে ভক্ষণ করিতেছি ? আসলে, দেবতার প্রতি ষোলআনা বিশ্বাসই নাই ?

যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।

যে কারণেই হোক্, আমরা সহজে ঠাকুরঘর আর ছাড়িতে চাই না। কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তর কাজ, এবং অনেক চিন্তা, এবং বাধাবিপত্তির সঙ্গে কেবলি সংগ্রাম। কিন্তু ঠাকুরঘরে কোন কাজকর্ম্ম নাই; কেবলি স্তবপাঠ এবং ঘণ্টানাড়া। অথচ নিজের কাছে এবং পরের কাছে অতি অল্প চেষ্টায় পরম পবিত্র ভক্তিভাজন হইয়া উঠা যায়।

যদি কেহ বলে, ওহে, কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ। আমাদের ঠাকুর বলেন, আমরা জাত-পুরোহিত, কাজকর্ম্মকে আমরা হেয় জ্ঞান করি; আমাদের পক্ষে সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এমন উন্নত মহান্‌ভাবে বলেন শুনিয়া তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলি—যে আজ্ঞা! আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন্। ম্লেচ্ছদের মত আপনি কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে সকল বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও

বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন্ এবং যে-গুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্য্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান্ এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করুন।

পঁহু।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্মাননীয়েষু!

পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের সাধনায় আপনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন আমার বোধ হয় সেটী ভুল। আপনি, দীনেন্দ্র বাবু ও বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। পুনঃ হইতে পঁহু যে হইতে পারে না সে সম্বন্ধে আপনারও সন্দেহ আছে। যেখানে পুনঃ অর্থ না করিলে পাঠ অসংলগ্ন হয় সেখানে পাঠ দূষ্য। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি, হিন্দীভাষায় তিনি কবিতা লিখিয়াছিলেন, অন্যে বাঙ্গলা ভাষায় তাহা অনুবাদ করেন। হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া বটতলার ছাপা পদকল্পতরু হইতে বাবু জগবন্ধু ভদ্র প্রথম বিদ্যাপতি স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত করেন। সেই গ্রন্থ-খানি হইতে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গ্রন্থের উৎপত্তি। তাহা হইতে বাবু সারদাচরণ মিত্র বাদসাদ দিয়া আর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া মিলাইয়া কেহ বটতলার পদকল্পতরুর ভ্রম সংশোধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন হয় না।

পুঁথি নকল করা পূর্ব্বে একটী ব্যবসায় ছিল। যখন বই ছাপা হইত না তখন এইপ্রকার ব্যবসায়ী লোককে দিয়া নকল করাইয়া লোকে পুস্তক সংগ্রহ করিত। লেখকদিগের হাতের লেখা ভাল হওয়া যত প্রয়োজনীয় ছিল, বানান শুদ্ধ হওয়া তত আদরণীয় ছিল না। বস্তুতঃ বানানের শুদ্ধতার আদর আধুনিক। অদ্যাপি হিন্দী লেখায় বানানের শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি পণ্ডিতদিগেরও নাই। হাতের লেখা পুঁথির বানান যেমন অশুদ্ধ একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করাইয়া দেখাই। বস্তুতঃ আমার এই পত্রেই বানান কত ভুল হইতেছে দেখিলে প্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করাইয়া দেখাইবার আবশ্যকতা থাকে না। পাছে কেহ মনে করেন এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে লোকের বানানের শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি অধিক ছিল, তাই দেখাইতে হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরগুলি এখনকার অক্ষর হইতে ভিন্ন ছিল। সেগুলি দেখাইবার আবশ্যক নাই, সেগুলিকে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বানান যথাযথ নকল করিয়া শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। যে পুঁথি হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম সেখানি দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের লেখা।

জথা রাগ—

অলখিতে হাম হেরি বিহসি পোরি।
জনু বয়নে ভেল চান্দ উজোরি॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥
কাহে শুন্দরি কেতুয় জান।
আকুল কিএ গেও হামারি পরাণ॥ ধ্রু
লিলা কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনি চকিত নিহারি॥ ইত্যাদি।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। প্রাচীন পুঁথি দেখিলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবেক। গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত পুঁথি প্রায় শুদ্ধ। কিন্তু নকলকার ও বটতলার ভূত ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না।

বানানভুল সংশোধন না করিয়া বিদ্যাপতির অনুবাদের ভাষার আনুমানিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া পুনঃ হইতে পঁহু স্থির করিতে হইলে শব্দবিদ্যাকে বিসর্জন দিতে হয়। এইরূপে পঁহু ও প্রভু শব্দের অর্থগত কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য আছে কিন্তু শব্দশাস্ত্রের কোন সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না। রবীন্দ্র বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের টীকা দেখিয়া প্রভুশব্দ স্থির করিয়াছেন আমার প্রেমহারের টীকা দেখিলে বুঝিতেন বঁধুশব্দ হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধু বঁধু এবং পঁহু একই শব্দ। পঁহু শব্দ কখন কখন পহু় রূপে লিখিত হয়। অদ্যাপি মিথিলায় সিংহ বা সিহ্ন না লিখিয়া লোকে সিঁহ লিখিয়া থাকে। এইরূপে লেখার দোষে ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ার্সন সাহেবও একবার প্রতারিত হইয়া শিবসিংহকে শিবসিঁ ও শিবসিঁহ লিখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এই পহু় শব্দের রূপান্তর পাহুন শব্দ কুটুম্ব বন্ধু ও আত্মীয় অর্থে বিহারের সর্ব্বত্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব লিখিয়াছেন পঁহু বা পহু় শব্দের অর্থ a husband, a beloved সুতরাং পঁহু ও প্রভুশব্দের কিয়ৎপরিমাণে যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে ইহা ঠিক।

বন্ধু ও বঁধু যে একই শব্দ, অনুনাসিক ন যে চন্দ্রবিন্দুতে অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হয় এ কথা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। বঁধু ও পঁহু যে একই শব্দ ইহা দেখান আবশ্যক। পঁহু শব্দের অর্থ প্রভু স্বামী প্রিয়জন ইহা রবীন্দ্র বাবু, দীনেন্দ্র

বাবু, অক্ষয় বাবু সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার নীচ শ্রেণীতে এই গানটী শুনা যায়।

বঁধু আছে উপবাসী, সরু চিড়ে কুটায়েছি
দুধকে পাঠায়েছি কলসী।
বঁধুকে খাওয়াব ভাত, কোথায় পাব মাগুর মাছ
কালীদহে ফেলাচেছি জাল।

এই বঁধু স্বামী না স্ত্রী না কুটুম্ব? বঁধু শব্দ প্রিয়ার প্রতি কি ব্যবহার হইত না?

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনুক রাগ এহন সন লগহছি
জাগল পয় পচোবান।
জুড়ি রহনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহিঁ আন।
এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহি হোয় যে জান।
বিদ্যাপতি।

বঁধু ও পঁহু যে একই শব্দ ইহা বিদ্যাপতির একটী গানে স্পষ্ট দেখা যায়।

নেহক বন্ধু সেহো ছুটি গেল
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল।

'ধ' যে 'হ'-তে এবং 'ব' যে 'প'-তে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা সকলই জানে। আমরা যাহা ধড়পড় বা ধড়ফড় বলি বিহারীরা তাহাই হড়বড় বলে। আমরা আঁকু বাঁকু বলি সাঁওতালেরা হাঁকোপাঁকো বলে। রাধিকা রাই বা রাহী শব্দে পরিণত হইয়াছে, সুধায়লি সোহায়লি হইয়াছে। সন্ধ শব্দ বাহু ও বহু হইয়াছে। হিয়া শব্দ হৃদয় বা ধীয়া হইতে হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না। বধির বহিরা হইয়াছে। বধূ বহু হইয়াছে, বিধি বিহি হইয়াছে।

স্বরের ক্রমবিকাশে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয়। ক্রমবিকাশের পর্য্যায় অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালা গ্রথিত হইয়াছে। ক খ গ ঘ স্বরের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। যেরূপ সংযোগে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয় সন্ধিসূত্রে তাহার উল্লেখ আছে। এগুলি দেবভাষাকথক সভ্যজাতির বাগ্‌যন্ত্রের উন্নতির পরিচয় দেয়। কিন্তু অপর জাতির অনুন্নত কণ্ঠে তাহারা কি রূপ ধারণ করে এবং সংযোগের বৈপরীত্যে কিপ্রকার বর্ণসঙ্কোচন হয় তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ক স্থানে গ, প স্থানে ব কখন্ হয় ইহা পাওয়া যায় কিন্তু গ স্থানে ক ও ব স্থানে প কখন্ হয় তাহা পাওয়া যায় না। হয়ত এরূপ অপভ্রংশতা নিবারণ করিবার জন্য অথবা ব্যাবৃত্তি অপেক্ষা সঙ্কোচন বিরল বলিয়া বৈয়াকরণেরা ইহাদের প্রক্রিয়া সূত্রবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাই বলিয়া ব্যবহারে গ স্থানে ক, জ স্থানে চ, দ স্থানে ত বা ব স্থানে প নিতান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তিকা বত্তিকা বত্তী (বাতি) ও পলতি হইয়াছে।

বল্লী পল্লী হইয়াছে।

বাত (সংবাদ) পাতা হইয়াছে।

বাবা বাপ হইয়াছে।

বাবু বাপু হইয়াছে।

বারি পানি হইয়াছে।

অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নাই কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

সে যাহা হউক বিদ্যাপতির বাঙ্গালা অনুবাদক প্রাচীন

মৈথিলী গ্রন্থে পঁহু শব্দ দেখিয়া তাহাই বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়াছেন। পাঁহুন শব্দ অদ্যাপি বিহারে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি বঁধু ও পঁহু উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন, উভয় শব্দই প্রিয়তম অর্থে পুরুষ ও নারীর প্রতি ব্যবহার হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রমতে বন্ধু হইতে বঁধু, বঁধু হইতে বঁহু, বঁহু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রভুশব্দ হইতে পঁহুশব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার এই বোধ হয়। কিন্তু আমার যে ভ্রম হয় নাই তাহা আমি বলিতে পারি না।

মধুপুর। বশম্বদ
২১ জুন। ১৮৯২। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
মান্যবরেষু।

আপনি বলিয়াছেন "অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।"

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এই জন্যই বাঙ্গলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে "শব্দশাস্ত্রের কোন সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।" কিন্তু যে হেতুক বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই ইহার সূত্র নির্দ্ধারণ করার কোন উপায় নাই। অতএব বাঙ্গলার আরো দুই চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি, আপনার তর্কটা এই, যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোন সংশ্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। "বন্ধু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই। যথা—কঙ্ক হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্ত্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্ব্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণতঃ অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই একটি শব্দ উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—শৈবাল হইতে শেঁয়লি, শ্রাবণ হইতে সাঙন।

তবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ধ" যেমন "হ"য়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তেমনি পবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ভ" ও অপভ্রংশে "হ" হইতে পারে এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোন মতান্তর নাই। তথাপি দুই একটা উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য—যথা, শোভন হইতে শোহন। গাভী হইতে গাই। (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই।) নাভি হইতে নাই। ("হি" হইতে "ই" হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোন ভ্রম না থাকে তবে, "প্রভু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহুর উদ্ভব হইতে আটক নাই আপনি তাহার

প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত "পঁহু" শব্দ বিদ্যাপতির কোন মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি? আমি ত গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলা-প্রচলিত পুঁথিতে কোথাও "পহু" ছাড়া "পঁহু" দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বহু, বহু হইতে পহু এবং পহু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙ্গালীর মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে ইহাই আমার নিকট অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর একটা কথা এই যে,—বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর", "রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ," "নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান" ইত্যাদি। এস্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধুশব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দুই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত স্থানে দেখিয়াছি, যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই, যদি আপনার সন্দেহ থাকে ত ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়তঃ, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব-অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ

পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ "হ"য়ে এবং "ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্য্যয় নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই।

নিবেদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা।

জাতির অবস্থার সহিত ধর্ম্মের যোগ অনুভব করিতে হইলে একবার বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—বিশেষতঃ বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং যে সমস্ত গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণন কিম্বা পূজাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড শাসক—তাড়না করেন, লাঞ্ছনা করেন, গঞ্জনা দেন, অকথ্য বলেন এবং খেয়াল অনুসারে কুত্তা লেলাইয়া দিয়া তামাসা দেখেন। আমরা লাঞ্ছনা সহি, গঞ্জনা সহি, গালি খাই এবং কুত্তাকে বিষম ভয় করি। রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ্ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের একশেষ। ন্যায়ান্যায়-

.বাধ রাজদণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জ্জিই একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা।

যেমন রাজশাসন দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছে মাত্র। অপরিণত-বুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্ব্বনাশভয়ে দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্ব্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোড়শোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।

দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগদ্বেষভয়হিংসা-বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায়। এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনও ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদ্‌শাহদেরই মত খামখেয়ালী মেজাজ—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট—কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয় বুঝা ভার। খেয়ালবশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয় তাহাকে ধন দেন রত্ন দেন, নবাবী প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইহাঁদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয় তাহার প্রতি তেমনি দুর্জ্জয় কোপ—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অনুগ্রহনিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাকে আমল দেওয়া চলে না। এবং সেটুকু কারণও অনেক সময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক

ঘটাইয়া থাকেন। হয় ত পুরাতন ভক্তে অরুচি জন্মিয়াছে, নূতন নহিলে মন উঠে না—অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কি করেন?—ভক্তের প্রতি এক দুঃসাধ্য হুকুম জারী করিলেন। ভক্ত বেচারী প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য আদেশ পালন করিয়া মরিল; কিন্তু দেবতার মায়া ত আর সে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহার মধ্যে গোপনে একটু ত্রুটি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাহির হইয়া আসিল—দুর্ব্বল ভক্ত-সন্তানের এতদিনের কায়মন ভক্তির চরম পুরস্কার!

এইরূপ খামখেয়ালী আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। কেবলি মানবের প্রতি নহে, ছোট দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারও এইরূপ। চণ্ডীর একবার সখ হইল, ইন্দ্রকুমার নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যে আপন পূজা প্রচার করিবেন। উপায় ঠাহরাইলেন, একটা কোন ছুতার অভিশাপ দিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিতে হইবে। ভগবতী শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিব মহা সঙ্কটে পড়িলেন। ইন্দ্র তাঁহার একজন একান্ত অনুগত সেবক, নীলাম্বর তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র, শিবপূজার জন্য স্বহস্তে ফুল তুলিয়া আনেন—বিশেষতঃ নীলাম্বরের শরীরে তিলমাত্র পাপ নাই; কোন্ ছুতায় শিব তাহাকে অভিশাপ দিবেন? ভগবতী পরামর্শ দিলেন—তাহার আর ভাবনা কি,

> যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
> তবে অভিশাপ দিবা কি দোষ তোমার॥

শিব অবিলম্বে সম্মত হইলেন। এখন কেবল নীলাম্বরের মহী ইচ্ছা করার অপেক্ষা।

ভগবতী মায়াপ্রভাবে একদিন নন্দনের সমস্ত ফুল হরণ করিয়া

রাখিয়াছেন। নীলাম্বর স্বর্গলোকে ফুল না পাইয়া পৃথিবীতে ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ব্যাধ ধর্ম্মকেতু এক রূপসী হরিণের পশ্চাতে তাড়া করিয়াছে—হরিণ আর কেহ নহে, স্বয়ং ভগবতী স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। নীলাম্বরের মন এই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ফুল হইতে বিচলিত হইল এবং তিনি মনে মনে বলিলেন যে, মালাকারের মত সাজি হাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ব্যাধের জীবন ঢের ভাল। ব্যাধজন্মের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যেটুকু বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে ফুলের সহিত একটি কণ্টক সংগ্রহ করিয়া আনায়, এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায়, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥

নীলাম্বর বা ইন্দ্র কেহই তাহা জানেন না। সুতরাং যখন

কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কণ্টক ফুটিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥

মহাদেবের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ভীমমুখে তিনি ইন্দ্রকে যথেচ্ছা ভর্ৎসনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, ফুল আমি তুলি নাই, নীলাম্বর তুলিয়াছে। নীলাম্বরের কৈফিয়ৎ তলব হইল, কিন্তু সে কৈফিয়তে কোন ফল হইল না। চণ্ডীর পরামর্শ মহাদেব ভুলেন নাই। অভিশাপ বাহির হইল—

মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
ত্বরিতে চলহ মহী দিনু অভিশাপ॥

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মহাদে(টলিলেন না।

আর একবার চণ্ডীর সখ হইল, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে হইবে। পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিয়া তিনি ঠাহরাইলেন, ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন। রত্নমালার প্রতি হুকুম জারী হইল—হরের সভায় আসিয়া নৃত্য করিবে। রত্নমালা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সভা পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন, রত্নমালা তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা সকলেই নৃত্যে মুগ্ধ। কিন্তু চণ্ডীর ত নৃত্য দেখা উদ্দেশ্য নয়—রত্নমালাকে মর্ত্ত্যে পাঠাইতে হইবে, একটা কোন ছুতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়া চাহি। মদনকে দেবী টিপিয়া দিলেন, রত্নমালার প্রতি একটা বাণ হান। মদন সম্মোহন শর ছাড়িলেন। রত্নমালার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল এবং তাল ভঙ্গ হইল। চণ্ডী শাপ দিয়া বাঁচিলেন।

বিচার এবং বিবেচনা বঙ্গসাহিত্যের দেবতাদের নিকট কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। কেবলি একদল খেয়ালপরিচালিত কর্ত্তৃপক্ষ—যাহার প্রতি অনুকূল হয়েন তাহার সাত খুন মাফ এবং বিমুখ হইলে বিনা দোষেও উৎপীড়নপরাঙ্মুখ নহেন। কালকেতু নগর বসাইতে হইবে—সেই জন্য চণ্ডী বিনা দোষে কলিঙ্গদেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রথমে ত কলিঙ্গনগরে গিয়া ঘরে ঘরে স্বপ্ন দিয়া আসিলেন যে, বীর কালকেতু যে নগর বসাইতেছেন তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর, অনেক ধনদৌলত মিলিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু স্বপ্ন সকলে শুনিল না। সুতরাং চণ্ডীকে

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি গঙ্গা সন্নিধানে চলিলেন।

সাধিতে আপন কাস আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা সম্মত হইলেন না। স্পষ্টই বলিলেন,

হইয়া বিষ্ণুর অংশ। কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
মোরে পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অধোমুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী গালি পাড়িলেন। বলিলেন, ভারি বৈষ্ণবী হইয়াছ দেখিতেছি, যত মকর কুম্ভীর পোষা হয়, আর কাজের সময় সাধ্বী সাজিয়া বসেন, একবার রকম দেখ গা! গঙ্গাও পাল্টা গালি দিতে ছাড়িলেন না। দুই পক্ষে ছড়া কাটাকাটি বেশ জমিয়া গেল। তখন পদ্মাবতী চণ্ডীকে সমুদ্রের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। ভগবতী, সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইল। ঝড়বৃষ্টিতে কলিঙ্গ হাজিয়া গেল। কলিঙ্গের প্রজা লইয়া কালকেতু স্বনগরে পত্তন করিলেন। বেচারা কলিঙ্গরাজের যে কি অপরাধ কেহ বুঝিতে পারিল না।

চণ্ডীর মহিমা সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ রহিল না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, জাগ্রত দেবতা এই বটে। নিত্য নূতন খেয়াল উঠে এবং অবিলম্বে খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ জবরদস্ত নহিলে দেবতা কিসের? কোন্দল করিতে হইবে—আচ্ছা তাই সহি; নৌকাডুবি করিতে হইবে—তথাস্তু; কাহাকেও কারারুদ্ধ করাইতে কপটাচরণ করিতে হইবে—বেশ কথা; দেবী কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। সারাদিন বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতীর সহিত কেবল ফন্দি আঁটিতেছেন—কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, কাহার পূজা লইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিপন্ন কিম্বা লুব্ধ ভক্তের সুদীর্ঘ চৌতিশা স্তবে এক একবার দেবীর মন বিচলিত হয়; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাকে? পদ্মাবতী গণনা করিয়া দেখেন—দেবী গতি করিয়া দেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর যেমন পদ্মাবতী ভারতচন্দ্রের অন্নদার সেইরূপ জয়া। জয়ার সহিত পরামর্শ না আঁটিয়া অন্নদা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এবং জয়াকে তাঁহার অষ্টপ্রহরই আবশ্যক হয়। অন্নদা চণ্ডীরই বিভিন্ন সংস্করণ। খেয়ালের রকমসকমও চণ্ডীরই অনুরূপ। সখ হইয়াছে, পৃথিবীতে পূজা প্রচার করিতে হইবে; জয়ার পরামর্শানুসারে একটা ছল ধরিয়া কুবেরানুচর বসুন্ধরকে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্ত্যে গিয়া মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। বসুন্ধর দেবীর পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল। দেবী শুনিলেন না। বিষ্ণুহোড়ের গৃহে তাহার জন্ম হইল—নাম হইল হরিহোড়। দুঃখীর ছেলে হরিহোড় অল্পদিনেই বাড়িয়া উঠিল। বনে মাঠে ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই কায়ক্লেশে পিতামাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে।

অন্নদা একদিন বুড়ী সাজিয়া সব ঘুঁটেগুলি একটি ঝুড়ী ভরিয়া রাখিলেন। হরিহোড় ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না। দেখিল, সব ঘুঁটে বুড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হরিহোড় ভাবিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বুড়ীর অনুগ্রহ হইল। সে হরিহোড়কে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়ী হইয়াছি, এত ভার বহিতে পারি না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বহিয়া দাও আমি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে পারি। হরিহোড় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু হরিহোড়ের কুটীর অবধি আসিয়া বুড়ী আর চলিতে পারে না—সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিহোড় বলিল, আমরা আপনার অন্নসংস্থান করিতে পারি না, অতিথিসৎকার করিব কি দিয়া? তখন বুড়ী বলিল, সে জন্য ভাবনা নাই, অন্নপূর্ণার নাম লইয়া হাঁড়ী পাড় দেখি,

হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥

তাহাই ঘটিল। হরিহোড় তখন বুড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নদা পরিচয় দিবার পূর্ব্বে হরিহোড়ের হস্তে একখানি ঘুঁটে দিলেন। ঘুঁটেখানি হেমঘুঁটে হইল। হরিহোড় অবাক্। দেবী তখন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া হরিহোড়কে বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে এই দেহ বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

অন্নদা তথাস্তু বলিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিয়া

ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

অবশেষে উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধকালে হরিহোড়কে সোহাগা নাম্নী একটি রূপসীর সহিত গৌরী বিবাহ দিয়া দিলেন। হরিহোড়ের ঘরে সোহাগীর শুভাগমন পর্য্যন্ত নিত্য কোন্দল ঝগড়া আরম্ভ হইল। অন্নদা নিজে কোন্দলপটু হইলেও পরের কোন্দল সহিতে পারেন না। হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িবার পন্থা বাহির করিলেন। হরিহোড়

একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান ধরে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে।
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহর যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন, যে কয়টি দেবতা আছেন এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আপন

পূজা গণিয়া কাটান—কে মানিল না মানিল, কে ভক্তি করে, ভকে করে না, কে খুসী, কে নারাজ। চাল কলা নৈবেদ্য আর সগোটা দুই প্রণাম পাইবার লোভে ইহাঁরা করিতে না পারেন হেন কাজ নাই। শুধু তাই নয়। এইগুলি না পাইলে বিষম ক্ষাপা। অদৃষ্টও তেমনি। এক একজন বিদ্রোহী জুটিয়া যায় তাহারা কিছুতেই বশ মানে না। মানব হইয়া দেবতাকে গালি পাড়ে, হেতাল হস্তে দেবতার মাথা লইবে বলিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে। দেবতা বেচারীকে হেতালের ভয়ে সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়—যে পাড়ায় হেতাল আছে তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসি-বার যো নাই। তাই বলিয়া দেবতার সহিত লোকে অবশ্য চিরদিন আঁটিয়া উঠিতে পারে না—তাঁহাদের কত দুর্ভেদ্য ফন্দি আছে! নৌকা ডুবাইয়া না হয়, ছেলে ক'টাকে শিঙ্গা ফুঁকাইয়া দিবেন। তাহাতেও না হয়, সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। দুর্ব্বল মানবশিশুকে জব্দ করা বৈ ত নয়—একটা না একটা উপায় খাটিয়া যাইবেই।

চাঁদ সদাগরকে লইয়া মনসা দেবী কি না করিয়াছেন? সেও বশ মানিবে না—তিনিও ছাড়িবেন না। মনসার সহিত তাহার নিরন্তর ঝগড়া বাধে। এবং

দেবীর কোপেতে তার ছয়পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না লোয়ায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর॥

আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে স্বাজ্যেতে বসতি॥

কিন্তু আপদ্ সহজে ঘুচে না। সদাগর সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে, মনসা সন্ধান পাইয়াছেন।

নেত লইয়া যুক্তি করে জয়বিষহরি।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।
বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি।
তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর। ইত্যাদি।

সদাগর সর্ব্বস্বান্ত হইল। তথাপি মনসার প্রতি তাহার বিদ্বেষ গেল না। মনসাও জুলুম করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ভিক্ষার উপরে সাধুর নির্ভর, গণেশের মূষিক ধার করিয়া আনিয়া তিনি তাহার ভিক্ষার অন্ন খাওয়াইয়া দেন। নিজের বাড়ীতে গিয়া চাঁদবেণে মনসার অনুগ্রহে ঠেঙ্গা খাইয়া মরে। মনসা গণকের বেশ ধরিয়া সাধুর স্ত্রীকে মিছামিছি বলিয়া আসিয়াছেন যে, আজ তোমার বাড়ী চুরী হইবে, সন্ধ্যার পর কলাবনে আসিয়া চোর অপেক্ষা করিবে, সেই সময় তাহাকে ধরিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিয়ো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সদাগর আসিয়া উপস্থিত—পরিধানে ছেঁড়া টেনা—সুতরাং লজ্জায় বেচারী আলো থাকিতে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। সনকা বেণেনী যথাসময়ে আসিয়া মনসার কথামত ব্যবস্থা করিল—সদাগরের পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিল। এই শেষ নহে। বেণেকে প্রতিপদে মনসা জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছেন। অনেক দিনের পর সদাগরের একটি পুত্র জন্মিল—নখীন্দর। সদাগর বেহুলা বলিয়া একটি রূপসী পাত্রী স্থির করিয়া তাহারই সহিত নখীন্দরের বিবাহ দিলেন। মনসার কোপে বাসরেই নখীন্দরের মৃত্যু হইল।

কিন্তু সদাগর বুলি ছাড়িল না। অবশেষে বহুদিন পরে বেহুলার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং ধনরত্ন সমুদয় ফিরাইয়া দিলেন। তখন চাঁদ বেণে মনসার পূজা করিল।

বেহুলার সেবার একটু বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবলোকের আরও কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবলোক যতটুকু দেখা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে পৃথিবীর কোন দৌরাত্ম্যেরই অভাব নাই—গালাগালি মারামারি হিংসাদ্বেষ অত্যাচার অবিচার বিভ্রমবিলাস সকলই ষোল-আনা আছে, অধিকন্তু সেখানকার ঋষিরাও নাচের মজ্‌লিসে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। মনসার ভাসানে দেবতাদের ঘরের খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেবতারা কি কাপড় পরেন, তাঁহাদের ধোপানী কে, সে কি দিয়া কাপড় কাচে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেহুলা ত এই ধোপানীর সাহায্যেই কার্য্য উদ্ধার করে। নেত ধোপানীকে সে মাসী বলিয়া ডাকে, দেবতাদের কাপড় দু'এক-খানা কাচিয়া দেয়, এমনি করিয়া ভাবসাব করিয়া থাকে। ধোপানী বেহুলার কাচা থান দুই কাপড় লইয়া গিয়া একদিন দেবসভায় উপস্থিত। সেদিন কিছু পরিষ্কার কাচা হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁগা বাছা, তুমি এত-দিন কাপড় কাচিয়া আসিতেছ এমন সুন্দর ত কোনও দিন হয় নাই—আজ হইল কিরূপে? নেত বলিল, আমার বোনঝি আসিয়াছে, এ কয়খান কাপড় সেই কাচিয়াছে। তখন

মহেশ বলেন নাহি দেখি এতদিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন॥
দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

পরে বেহুলাকে সে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় লইয়া গেল। সেখানে বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। এখন মনসাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হয়। নেত ধোপানী মনসার প্রিয়সখী—অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া মনসাকে দেবসভায় লইয়া আসিল। দেবতারা পাঁচজনে বেহুলার হইয়া ওকালতী করিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর কল ফলিল। কিন্তু মনসার তরফে ইনাইয়া বিনাইয়া ন্যাকামি করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই বলা বাহুল্য। একে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, তাহাতে আবার নারী!

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড় কর্ত্তাটির অপকীর্ত্তি ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত 'খেলো' অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ—যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন। নেত ধোপানীর সহিত 'ইয়ারকি' দিতে হইলে সম্ভ্রম বজায় রাখা বোধ করি কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। চরিত্রের বল থাকে না। অন্নদামঙ্গলের শিব মদনের একবাণে একেবারে দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য। মদনকে ভস্ম করিয়াছেন নিতান্তই যেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরোধে।

ভাগ্যে ভাগ্যে নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নারদ গৌরীর সন্ধান দিলেন।

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।

নারদ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।

"বাবা" সেদিন চলিলেন না—তাঁহার ত আর দায় নয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিবাহের সব স্থিরস্থার হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার—হুলাহুলির ধূম। এদিকে বাঘছাল খসিয়া পড়ে—শিবের হোষ নাই। মেনকা নারদের উদ্দেশে গাল পাড়িতে সুরু করিলেন,

হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়।
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্র ভরসা দিয়াছেন—

কোন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক।

যাহা হোক, বিবাহ করিয়া শিব গৌরীকে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধিঘোটনের ধূম পড়িয়া গেল। তাহার পর হরগৌরীর কথোপকথন। শঙ্কর দেবীকে বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

গৌরী পুরুষজাতির একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বলিলেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবতাদের এই অবস্থা! পুরুষ মহলে ভাঙটুকু ধুতুরাটুকু খাওয়া আছে, মজলিসে নাচটা আশটা দেওয়া আছে, এবং আনুষঙ্গিক দোষেরও ত্রুটি নাই; স্ত্রীমহলে ঝগড়া কোন্দল—এখানকার প্রথিতনামা পাড়াকোন্দনীরাও তাহার নিকট হার মানেন।

দেবলোকে সবই আছে—নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগস্বীকার, কোনরূপ উচ্চ আদর্শ। না থাকিবারই কথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণে আমাদের সমস্ত হৃদয় তখন জোড়া—উচ্চ আদর্শ ঠাঁই পাইবে কোথায়? রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র শিথিল—কেবলি রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এবং সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ। সামাজিক আদর্শও এই শাসন-নীতিরই প্রভাবে গঠিত।

এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি। বিচিত্র বিভিন্ন শক্তি এক বৃহৎ শক্তিতে নিমগ্ন এবং এক মূল শক্তি সহস্র বিরোধী শক্তিকে নিয়ত নিয়মিত করিতেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজতন্ত্রও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। উপধর্ম্ম এবং উপদেবতার প্রভাব প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

স্যর লেপেল্ গ্রিফিন্।

কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোন-

প্রকার গাম্ভীর্য্য অথবা গৌরব নাই—কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার্ লেপেল্ গ্রিফিন জুন মাসের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হৌক্, বাঙ্গালীদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোন ফল না হউক্ আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট্ করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কন্‌গ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানা কারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজে দেখে। এজন্য গ্রিফিন্ সাহেব ধন্য।

তিনি আরো ধন্য যে, তিনি কোন যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপক্বতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্ব্বল

ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি জিনিষটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্ব্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। গ্রিফিন্ যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙ্গালীর কোন স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙ্গালী জিলাশাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙ্গালী মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোন অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূল তত্ত্ব গড়া যায় কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরাজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোন কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে

একটা সংযত আত্মমর্য্যাদা থাকে; কারণ, যে লোক সৌভাগ্যবান্ এবং ক্ষমতাবান্ তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মত যাহারা দুর্ভাগা, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরাজি বড় কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্বটিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন্ বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্ব্বে নিজেদের পার্লামেণ্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরাজ মন্ত্রীসভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে—এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন।

ভারতবর্ষের কৃষক প্রজাদিগের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ তদন্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট সম্প্রতি একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গত মে মাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় রাজ উদয় প্রতাপ সিং এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন এবং উকীল মহাজন প্রভৃতি "হঠাৎ জমিদার"দিগের দ্রুত উত্থানই

যে প্রজাদিগের এই দারিদ্র্যের মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই হঠাৎ জমিদারেরা বারোমাস সহরে বাস করেন। নিজ প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কেবল অত্যাচার এবং অবিচারে ইঁহারা সবিশেষ পটু। সুতরাং ফল যে এইরূপ শোচনীয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এখন গবর্মেণ্ট যদি বুনিয়াদী জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে আশা করা যায়।

গবর্মেণ্ট যতদিন রীতিমত খাজনা পান, ততদিন জমিদারেরা যে শ্রেণীর লোক হৌক না কেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। লেখক বলেন, এই মতটি সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের দেশে জমিদারেরাই যখন গবর্মেণ্ট এবং প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে, তখন উকীল মহাজন প্রভৃতি দ্বারা কি এই সম্বন্ধ সুরক্ষিত হইতে পারে! যাহাদিগের অর্থলিপ্সা রাজভক্তি অপেক্ষা বলবতী এবং প্রজাদিগের সহিত যাহাদিগের কেবল স্বার্থসম্বন্ধ, কোন বিচক্ষণ গবর্মেণ্টও কি তাহাদিগের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে! যাহাদিগের যুগপ্রবাহিত কুলমর্য্যাদা আছে এবং যাহারা প্রাণ অপেক্ষা মানকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করে কেবল তাহাদেরই দ্বারা নিমকহারামী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উদাহরণস্বরূপে লেখক বলরামপুরের মহারাজা এবং রাজা দেবীবক্স সিংএর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন ব্রিটিশ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তখন ইঁহাদের মধ্যে একজন নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কতক-

গুলি ইংরাজ বন্ধুকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অপরজন বিপন্ন গবর্মেণ্টের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিয়া তবে নিজে বিদ্রোহে যোগ দান করেন। লেখক বলেন, বংশানুক্রমে বীজ সঞ্চিত হইয়া তবে এইরূপ মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়।

সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশের প্রতি সাধারণের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে লর্ড ক্যানিংএর মন্তব্য তুলিয়া লেখক তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। লর্ড ক্যানিং বলেন, অযোধ্যায় যখন বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন, পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া সমগ্র প্রজামণ্ডলী তালুকদারের আদেশে গবর্মেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। প্রজারা জমিদারকেই যে প্রকৃত রাজা বলিয়া সম্মান করে এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সম্মতিআইন পাশ হইবার সময় এবং রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকালে ইতর সাধারণের উপর উচ্চকুলের যে জয়লাভ হয় লেখক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন প্রকাশ্য আন্দোলন উঠিবার বহুপূর্ব্বে গবর্মেণ্ট উচ্চকুলোদ্ভব জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।

এই উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে লেখক তাহারও তিনটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) এইরূপ আইন গঠন করা যাহাতে জমিদারেরা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা অর্থ কর্জ্জ লইবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে না পারে।

(২) যে সকল জমিদার প্রাইমোজেনিচার অর্থাৎ অগ্রজই বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী এইরূপ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী তাহাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা।

(৩) যাহাতে ঋণগ্রস্ত জমিদারেরা সুব্যবস্থার জন্য সম্পত্তি গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারে তাহার সুবিধা করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, ইংরাজি আইনে যাহাকে এণ্টেল-স্বত্ব (দানবিক্রয়-ক্ষমতাশূন্য হইয়া পুরুষানুক্রমে কেবল উপভোগ-স্বত্ব) বলে, ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক না হইলেও পরিবর্ত্তিতাকারে ভারতবর্ষের পক্ষে যে ইহা ঠিক উপযোগী হইবে তাহার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ডে জমিদারেরা ভূসম্পত্তির উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে। আমাদের দেশের জমিদারেরা কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মণভোজন, শ্রাদ্ধ বাইনাচ প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষুধিত মহাজনের উদরপূরণ করে। আইন দ্বারা এই অনিষ্ট দূর করা ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই।

এণ্টেল স্বত্ব আমাদের দেশে যে সম্পূর্ণ নূতন নহে লেখক তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। রাজপুতানায় এই প্রকারের স্বত্ব কতকটা প্রচলিত আছে এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক বিষয়ে পিতাপুত্রের সমকালীন স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ পুত্রের অমতে পিতা সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে ইহাতে প্রচলিত হিন্দুপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যেখানে প্রচলিত প্রথা দেশের উন্নতি এবং সংস্কারের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে গবর্মেণ্ট এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে অযোধ্যার এক শ্রেণীর তালুকদার ইচ্ছা করিলেই প্রাইমোজেনিচার আইন অনুসারে

কার্য্য করিতে পারে। এখন এই অধিকার আর একটু বিস্তৃত করা, কথা এই বৈ ত নয়।

তৃতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, সম্পত্তির ব্যবস্থাভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্মেণ্টের এখনও আছে, কিন্তু এই ক্ষমতা যাহাতে যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে না পারে সেই জন্য আইনবন্ধন আবশ্যক।

প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে বুদ্ধিমান এবং মূর্খ দুই দল লোক থাকে। মূর্খের দমন করিতে গিয়া আইন দ্বারা বুদ্ধিমানের উন্নতির পথ বন্ধ রাখা গবর্মেণ্টের পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইবে সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

লেখক উকীল এবং মহাজনদিগের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের নিকটে ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। বুনিয়াদী জমিদারদিগের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ইঁহারা সকলেই যে রাজভক্তি এবং মহত্ত্বের এক একটি মূর্ত্তিমান আদর্শ এবং হঠাৎ জমিদারেরা সকলেই যে এক একটি আত্মসম্মান-বিবর্জ্জিত রাজদ্রোহী সেটা লেখকের কল্পনামাত্র।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ। লয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। প্রাইভেট্ টিউটার। পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোট গল্প।

গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয়, একটা দুটা আত্মহত্যা, নয়, সমাজ-বিদ্রোহ, নয়, কোন রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক্, লেখক এমত ভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁদা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণতঃ নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক—একদিকে হৃদয়ের টান, আর একদিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর—একটুখানি উপন্যাসের ধরণে প্রেমচর্চ্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রার একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা সখ মাত্র, কিন্তু শাম্‌লা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত সখের নহে, ঐটেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোন রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরাণী নহে, সে উপন্যাসের নায়ক—কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব। বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ়। কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে—তাহার প্রধান কারণ

খবর আমরা পাইনা, খাঁটিখবর আমরা চাইওনা—মনে করি, খুব অলঙ্কার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোন একটা আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপুত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেই জন্য আসল কথাটা ভাল করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনী গাহিতে, বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্র বাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। "সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা" প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

প্রশ্ন।

৬। কি কারণবশতঃ যোগবিয়োগগুণভাগে আমরা অযুগ্ম সংখ্যা অপেক্ষা যুগ্ম সংখ্যা করিতে পারি? যুগ্ম সংখ্যার যোগবিয়োগ গুণভাগ অযুগ্ম সংখ্যার অপেক্ষা আমাদের সহজে মনে থাকেই বা কেন? আটে আটে যোল, ইহা আমাদের মনে রাখিতে যত অল্প কষ্ট হয় সাতে নয়ে যোল মনে রাখিতে মন হয় না কেন?

পাঠক। বীরভূম

সাধনা।

স্বর্ণমৃগ।

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিকের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশ-চন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবন-সমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যা-ভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার এক পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল

কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। গ্রামের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না। পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডিমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলমকাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠির প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসু-

বিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চাম্‌চিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষ-জাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিত্রাণ নহে। এক এক-দিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও!" বৈদ্য-নাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা—বন্ধ করিলে কি চলিবে?—ছেলেরা খাইবে কি?" গৃহিণী উত্তর করিতেন "আমানি।" আবার কোনদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন "আমি জানি না। কি করিতে হয় তুমি কর।" বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন "কি করিতে হইবে?" স্ত্রী বলিতেন "এমাসের মত বাজার করিয়া আন।" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত। বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন "এত কি আবশ্যক আছে?" উত্তর শুনিতেন "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব শস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরী

করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই। একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।" সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে

লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল। ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল; দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল "কাল সোনার রং ধরিবে।" সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই— পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই। সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহ-প্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়। মোক্ষদা এম্নি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই। অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কি আনিয়াছি বল দেখি!" স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!" বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট্‌ষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন। গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন "আ মরে' যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ

বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবা-বস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অ-বিশ্বাসের কারণ রহিল না। গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণপ্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানু-

ষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।" কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল; টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল। মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্বোন্মুখ ধান্যক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছে!"—ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা

হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিস্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠ-ভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।" অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা!" ছোটটিও মনে করিল বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা!" বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন। অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!" বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠি হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন। পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে। বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কাশী যাইতে পারিব না।" বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্র-কারগণ লিখিতেছেন স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিত পটুত্ব"

আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল। ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন। দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতের নির্ম্মাণ! ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন। বড় ছেলেটি বাপের

মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণ-মাত্র করিয়া কহিল "বাবা; আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না। বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে। বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিত-হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয়

এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না। রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল। বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝে-ময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেজে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল। বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেথান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন। দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল। ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না। একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এই জন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্‌লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত কি কারণে প্রবল হয় এবং শিক্‌লি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে। বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য। তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন ভিতরে কিছুই নাই—উপুড় করিয়া ধরিলেন কিছুই

পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না। দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠিতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবতঃ এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিঃশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন। জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল। আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান। কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলের ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন। শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?" বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে

শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্য-নাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল "বাবা!" তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশীগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথকে দেখিতে পাইল না।

পরশ-পাথর।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা, ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
ছটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে।

নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাখে ছাই ধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোণারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার!
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
খ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশপাথর!

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোণার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ;
মিলি' যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ;
বহুকাল স্তব্ধ থাকি' শুনেছিল মুদে' আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশপাথর!

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা!
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত!

যত করে হায় হায়, কোনকালে নাহি পায়
তবু শূন্তে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর!
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকিও দেখি!
সোণার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোণা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন!
কপালে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর!

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোণার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোণার স্বপন।

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে' হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ!
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ পুনঃ করিতেছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর!

লোক-চেনা।

প্রকৃতি-লক্ষণ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে অবিমিশ্র প্রকৃতি-ত্রয়ের লক্ষণ বর্ণনা করা গিয়াছে। আর একবার উহা সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক। বলময়ী অর্থাৎ অস্থিপেশীময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—বলবতী ইচ্ছা-শক্তি; স্থির বিবেচনাশক্তি; অক্লান্ত উদ্যম; অসীম সাহস; অবিরতচেষ্ট সঙ্কল্প; দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বলালসা; অবিচলিত আত্ম-নির্ভর। প্রাণময়ী অর্থাৎ দৈহিক পুষ্টি সাধনোপযোগিনী প্রকৃতির লক্ষণ—দৈহিক স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, আবেগ-বশবর্ত্তিতা, উৎসাহ, আগ্রহ, সুখ-লালসা, বৈচিত্র্যানুরাগ, আরাম-বাসনা,

ভোগলালসা, দ্রুত ও চটকদার বুদ্ধি, উদ্দেশ্যের অস্থিরতা, সৌম্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। মনোময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—জ্ঞানস্পৃহা, মনস্বিতা, সুরুচি, ভব্যতা, উচ্চস্পৃহা, উন্নত কল্পনা, তীব্র অনুভাব, সাহিত্য শিল্পানুরাগ ইত্যাদি। এই তিন প্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্যই পূর্ণাবয়ব চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। প্রায়ই দেখা যায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রে দুইটি প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রবল, অপরটি ক্ষীণতর। আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুসারে এই মিশ্র প্রকৃতিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি।
২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।
৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।
৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি।
৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি।
৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি।

এই মিশ্র প্রকৃতির নামকরণ দেখিলেই বুঝা যায় উহার প্রত্যেকটিতে কোন্ ধাতুর বিশেষ প্রভাব। অপেক্ষাকৃত যাহার অধিক প্রভাব তাহাকেই প্রথম আসন দেওয়া হয়। যথা, যে স্থলে প্রাণ অপেক্ষা বলের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য, সে স্থলে বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি বলা যায় এবং যে স্থলে বল অপেক্ষা প্রাণের প্রাধান্য সে স্থলে প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি বলা যায়।

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি। পাশব বলের পক্ষে এই প্রকৃতি অতীব উপযোগী। অস্থি-পেশী বেশ পরিপুষ্ট; স্কন্ধদেশ চওড়া; বক্ষদেশ প্রশস্ত; জীবনীশক্তি যথেষ্ট; দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অবিচলিততার সহিত কর্ম্মশীলতা জড়িত। এই প্রকৃতিতে

একটু আনাড়িপনা থাকিতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, কঠোর শ্রমশীলতা এই প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা বুদ্ধি বিদ্যার পক্ষে তেমন উপযোগী নহে—শিল্প-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকদিগের সহজ বিষয়বুদ্ধি সতেজ—বিষয়কর্ম্মে তাহারা বেশ স্থিরবুদ্ধি। অনেক সচ্চরিত্র লোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়—আবার অনেক বদ্‌মাইশ অপরাধীও এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। উচ্চ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে, এই প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করে। রাগ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপুসকল প্রবল হইয়া এই প্রকৃতিকে কুৎসিৎ করিয়া তোলে। লড়াক্কা পালোয়ান, খালাসী, সেপাহি, কৃষক প্রভৃতি—মুক্তবায়ুতে যাহাদিগের দৈহিক শ্রম করিতে হয়—প্রায় তাহাদিগেরই মধ্যে এইরূপ প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।—যে প্রকৃতিতে বলের ভাগ বেশি, মনের ভাগ তার নীচে এবং প্রাণের ভাগ সকলের নীচে। এই মিশ্রণফলে বুদ্ধিশক্তি এবং তাহার সহিত দৈহিক বল, কঠোরতা ও সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি অপেক্ষা দেহ যদিও কিছু সরু—কিন্তু পেশী অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় এবং এই প্রকৃতির লোক অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্যমশীল হইয়া থাকে। উহারা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়, দ্রুতভাবে ও উদ্যমসহকারে পদচারণ করে এবং উহাদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সবল। এই-প্রকার মিশ্র প্রকৃতির লোকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশীল, কার্য্যে সাহসী, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী। ইহাদের দুর্দ্দান্ত রিপুসকলও কতকটা উচ্চ ধর্ম্মবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-বৃত্তির অধীনে থাকে। গভীর বিদ্যা, অকপট কার্য্যোৎসাহ, ব্যবহারিক বিষয়-বুদ্ধি

উচ্চাভিলাষ, কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভের বাসনা, এই সকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যোদ্ধা, নবদেশানুসন্ধায়ী, যন্ত্রশিল্পী—জাহাজনেতা নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। ইহারা চিন্তাশীল ও কাজের লোক উভয়ই।

৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।—বৃহৎ চওড়া শরীর, স্কন্ধ প্রশস্ত, ঘাড় মোটা, পেশী-বহুল দেহ, সবল অস্থি-সন্ধি—কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সুগোল—এবং মুখাবয়বসকল বহির্ম্মুখ ও আশু-পরিলক্ষ্য; মুখের ভাব একটু কর্কশ; পদচারণ সজোর ও দ্রুত—কিন্তু সে চলা-ফেরার শ্রীর অভাব।—এই সমস্ত প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতির লক্ষণ। যাহাদিগের এইরূপ প্রকৃতি তাহারা কঠিন শ্রমে কাতর নহে, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও অঙ্গ-চালনা করিতে ভালবাসে এবং তাহারা কোনপ্রকার আটক বা বন্ধন সহ্য করিতে পারে না। প্রাণ-ধাতুর প্রাধান্যবশতঃ তাহারা বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও আবেগ-বশবর্ত্তী; কিন্তু অস্থি-পেশীতন্ত্রেরও কতকটা প্রভাব থাকায়, তাহারা মনের উচ্ছ্বা-সকে একটু সংযত করিয়া রাখিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা চটুল কিম্বা চটক্‌দার হয় না; ইহারা কাজের লোক; সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। ইহাদের বেশ সহজ বুদ্ধি; কাজকর্ম্ম বেশ চালাইতে পারে; ইহারা সফরী-ফর্ফর-বৎ ভাসা-ভাসা নানা বিদ্যার অধিকারী হয় না। উচ্চ ধর্ম্ম-বৃত্তির বল না থাকিলে, ইহাদের প্রচণ্ড রিপুবেগ ইহাদিগকে সহজেই বিপথে লইয়া যাইতে পারে।

৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি। এই মিশ্রণের ফল;—মোটা-সোটা সুগোল গঠন; মুখ বড় ও পরিপুষ্ট; মুখাবয়ব সুশ্রী, বেশি বহির্ম্মুখ নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্টরেখাঙ্কিত ও সমবিন্যস্ত।

অনেক স্ত্রীলোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। স্ত্রী-উপযোগী অনেক বাঞ্ছনীয় মনোরঞ্জন গুণ এই প্রকৃতিতে বর্ত্তে। যথা, স্নেহ মমতা, দয়া, ভালবাসা, সৌম্যতা, প্রফুল্লতা এবং তাহার সঙ্গে দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য। এই প্রকৃতি কতকটা আমোদ-প্রিয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে কতকটা ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই প্রকৃতির পুরুষেরা বাহিরের কাজের উপযোগী। ভাল শিক্ষা পাইলে, ইহারা উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারে; ইহারা কোন সার-গর্ভ বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না; গভীর চিন্তা কিম্বা কোন বিষয়ে তন্নতন্ন অনুসন্ধান ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইহারা একটু চটুল ও চটক্‌দার; ইহাদের নূতনত্ব কিম্বা উদ্ভাবনী বুদ্ধি তেমন নাই। ইহাদের লেখা ও বক্তৃতা বেশ অনর্গল-প্রবাহী, প্রায়ই অলঙ্কারপূর্ণ এবং কখন কখন অতিপ্রাচুর্য্যদোষে দূষিত। ইহারা দ্রুতগামী, চলাফেরায় শ্রীবিশিষ্ট এবং কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতির লোকে একটু লম্বা ও ঈষৎ পাতলা ধরণের; অবয়ব-রেখা একটু কোণবিশিষ্ট—একটু খোঁচ্‌বিশিষ্ট; কিন্তু ইহাদের আকার-প্রকার বেশ সম্ভ্রান্ত ও দৃষ্টি-আকর্ষক; ইহাদের দাঁড়াইবার ভাবে বেশ একটু ঋজুতা আছে; মুখাবয়ব সকল একটু বহিরুন্মুখ কিন্তু পাথরে খোদা মূর্ত্তির ন্যায় বেশ স্পষ্ট রেখাবিশিষ্ট ও চাঁচা-ছোলা; মুখের ভাব গম্ভীর; কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, উচ্চ-গ্রাম-স্পর্শী ও সুনম্য; চলাফেরা বেশ দৃঢ় ও স্থিরলক্ষ্যানুবর্ত্তী। এই মন ও বল-ধাতুর সহিত কতকটা প্রাণ-ধাতুর সংযোগ হইলে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হয়। যাহাদের এইপ্রকার প্রকৃতি তাহাদের বুদ্ধিশক্তির সহিত

কার্য্যক্ষমতা জড়িত। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি কাজ-কর্ম্ম, যে-কোন বিষয়ে তাহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও সফলতা লাভ করিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা গম্ভীর ও সারাল ধরণের সাহিত্যের অনুরাগী, বিজ্ঞানের ভক্ত; এইপ্রকার প্রকৃতি গ্রন্থকার হইবার পক্ষে উপযোগী। অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার এই প্রকৃতির লোক। ইঁহাদের লেখার ধর্ম্মনীতির একটা অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত থাকে—ইহাঁদের পাশব-প্রবৃত্তিসমূহ স্বভাবতই ক্ষীণ এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীন।

৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতিটিও অতিশয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকেরা যতটা উন্নতমনা, প্রিয়দর্শন ও চটক্‌দার, ততটা সারাল, জোরাল, দৃঢ়সঙ্কল্প কিম্বা অবিরতচেষ্ট নহে। ইহাদের দেহ ঈষৎ খর্ব্ব; দেহ ও মুখ মাঝামাঝি পরিপুষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুডৌল ও ক্রম-সংকীর্ণ। মুখাবয়ব তেমন বহির্ম্মুখ ও আশু-পরিলক্ষ্য নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট-রেখা-বিশিষ্ট এবং সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও সুন্দর। মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা, মধুরতা ও সহৃদয়তা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। চঞ্চল মস্তিষ্ক, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, সাহিত্য ও সৌখীন শিল্পে অনুরাগ, প্রবল গার্হস্থ্য ও সামাজিক ভাব, সমুন্নত নীতি ও ধর্ম্মভাব, আত্যন্তিক সৌম্যতা, দয়া মমতা কোমলতা ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা—এইসকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে মন-বলময়ী-প্রকৃতিসুলভ ওজস্বিতা, দৃঢ়তা, উদ্যমশালতার অভাব লক্ষিত হয়। অনেক বক্তা, কবি, উপন্যাস-লেখক শিল্পীর মধ্যে এই প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় (যদিও তাহারা ঐ দলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে)। অনেক স্ত্রীলোকও এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, মন-বলময়ী ও মন-প্রাণময়ী এই দুই মিশ্র প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অধিকাংশ বড়লোক এই দুই প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সমঞ্জসীভূত প্রকৃতি। তবে, মন প্রাণ বল এই তিন ধাতুর মধ্যে কোন দুইটির প্রভাব যেন চরিত্র-বিশেষে অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্টরূপ লক্ষিত হয় এই মাত্র। কেন না, পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায়ই কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—একটু উনিশ বিশ হইয়াই থাকে। যেমন মনে কর, ব্রাইট্ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্। এই দুই জনেরই প্রকৃতিতে উল্লিখিত তিন ধাতুর প্রায়ই সমঞ্জসীভূত সমাবেশ আছে। তবে ব্রাইটের প্রকৃতিতে প্রাণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-প্রাণ-প্রকৃতির কোটায় ফেলা যায়, আর গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-বল-প্রকৃতির সামিলে আনা যায়। যাঁহারা এই দুই জনের প্রতিকৃতি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের প্রকৃতি-গত প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয়েরই প্রশস্ত ও উন্নত ললাট—কিন্তু ব্রাইটের প্রকৃতিতে পুষ্টিতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আধিক্য ও গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে অস্থিপেশী-তন্ত্রের আধিক্য। ইঁহাদের চরিত্র ও বক্তৃতাতেও এই প্রভেদ বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ব্রাইটের বক্তৃতা পড়িয়া দেখ, উহা বেশ প্রাঞ্জল, সুললিত, জলবত্তরল—উহাতে ঘরো কথার আধিক্য। এবং গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতার বাক্যসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল, গভীর ও ওজস্বী। ইহাতে একজনের হৃষ্টপুষ্ট মুখের আমেজ্ পাওয়া যায়—আর একজনের দৃঢ় কঠোর অস্থি-পেশীর আভাস উপলব্ধি হয়। ইঁহাদের বক্তৃতা দিবার ধরণেও এই

প্রভেদ অনুভব হয়। শুনিয়াছি ব্রাইট্ যখন বক্তৃতা করিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সহিত সহৃদয়-ভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন ; কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোন্ যেন প্রতি কথা নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া সবলে বাহির করেন—এবং তাঁহার এক একটি ওজস্বী কথা যেন শ্রোতাদিগের মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ের মত আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া দৃঢ়তা, উদ্যম, শ্রমশীলতা, অবিরত-চেষ্টতা—যাহা বল-প্রকৃতির লক্ষণ, তাহা ব্রাইট্ অপেক্ষা গ্লাড্‌ষ্টোনে শতগুণ অধিক।

আমাদের দেশের দুই একটা ঘরো দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার এজ্‌লাসি কাজকর্ম্ম সত্ত্বেও যে এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিয়াছেন—তাহা কেবল অস্থি-পেশীতন্ত্রের প্রভাবে—যদি তাঁহার বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের প্রভাব বেশি হইত তাহা হইলে পারিয়া উঠিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের অক্ষয় বাবুর (অক্ষয়কুমার দত্ত) দৈহিক প্রকৃতিতে বল-ধাতুর অভাব থাকায়, তিনি গোটাকতক ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই অচিরাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লেখায় যে লালিত্য, সুন্দর বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার প্রাণময়ী প্রকৃতির গুণে বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতিগত প্রাণধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখায় ভাবের এত সরসতা—এবং তাঁহার প্রকৃতিগত বল-ধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখনীর এত প্রখরতা। এই জন্য তাঁহার লেখা "প্রখরে মধুরে" বেশ মিশিয়াছে। এই জন্য বঙ্কিম বাবুর লেখায় যুক্তির এত বাঁধুনি ও ফাল্‌ত বাজে-বকুনির অভাব। যাঁহাদের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের আধিক্য, অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা অপেক্ষা ললিত বাক্যবিন্যাসের দিকে তাঁহাদের অধিক টান।

তাঁহাদের লেখায় একটু শব্দবাহুল্যও হইয়া পড়ে। বাক্যকে সুশ্রাব্য করিবার জন্য হয়তো একই ভাব তাঁহারা ভিন্ন কথায় তিনবার করিয়া ব্যক্ত করিবেন। তাঁহাদের লেখায় যুক্তির ভাগ কম, উচ্ছ্বাসের ভাগ একটু অধিক। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যতটা গর্জ্জন ততটা বর্ষণ নহে—যতটা শব্দঘটা, ততটা সার নাই। আর এক দৃষ্টান্ত, আমাদের চন্দ্রনাথ বাবু। ইনি সুলেখক বটে, কিন্তু ইহাঁর লেখায় যেন প্রাণ-ধাতুর অংশ একটু বেশি মাত্রায় আছে বলিয়া বোধ হয়—একটু যেন অস্থি-পেশীর অভাব। বঙ্কিম বাবুর মন-বলময়ী প্রকৃতি; চন্দ্রনাথ বাবুর মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁরা মন-বলময়ী প্রকৃতির জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত যত পাই ততই আশার সঞ্চার হয়। আমাদের সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কেও বোধ হয় এই কোটায় ফেলা যাইতে পারে—তাঁহারও শ্রমশীলতা ও উদ্যম য়ুরোপীয়-সুলভ।

আমাদের বঙ্গদেশে প্রাণ-ধাতুরই একটু বেশি প্রাদুর্ভাব। প্রাণ-ধাতু সম্পূর্ণাবয়ব হইলে মন্দ নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণের দুই উপাদান রস ও রক্তের মধ্যে রসাংশটই বাঙ্গালীর দৈহিক প্রকৃতিতে বেশি দেখা যায়—তাহাতে তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া আলস্য ও জড়তা উৎপন্ন হয়। যে দেশের জলবায়ু আর্দ্র সেই দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের প্রাণধাতুর আধিক্য ও বলধাতুর অভাব থাকায় আমরা সহজে হুজুকে মাতিয়া উঠি—বৈদেশিকদিগের টিট্‌কারি সহ্য করিতে না পারিয়া হয় আমাদের নিজস্ব সহজে ছাড়িয়া দিই—অথবা সমাজের ভয়ে জড়সড় হইয়া বাস্তবিক কোন অশুভ প্রথাও

পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। আমরা কোন বৃহদ্ব্যাপার সমাধা করিয়া তুলিতে পারি না—যাহাতে অবিরত চেষ্টা অবিশ্রান্ত শ্রমের প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি না। যে সকল কার্য্যে উপস্থিতমত বাহবা পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্য করিতেই আমরা ভালবাসি—আমরা খুব চটক্ লাগাইয়া দিতে পারি কিন্তু কোন সারবান্ স্থায়ী কার্য্য আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। অতএব মনোময়ী ও বলময়ী প্রকৃতির যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য—তাহার প্রধান উপায় জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা, উপযোগী আহার ও ব্যায়াম-চর্চ্চা। মন, বল, প্রাণ—আর এক কথায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাব—কিম্বা দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনের সামঞ্জস্য না হইলে মানব-চরিত্রের কখনই পূর্ণতা লাভ হয় না।

জাহাজের কাহিনী।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

১৪অক্টোবর। জিব্রল্টার পৌঁছন গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্চে।

আজ ডিনারটেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকীস্বরে বল্লেন—পাখাওয়ালারা রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বল্লে তার একমাত্র প্রতিবিধান হচ্চে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা

তপ্ত শূল বিঁধ্‌ল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশী দুর্ব্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে' দেবে তার আর বিচিত্র কি? আমিও ত সেই অপমানিত জাতের একটা লোক, আমি কোন্‌ লজ্জায় কোন্‌ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে' খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি!—শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথা বহুচেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না! বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরাজী ভাষাটা বড়ই বিজাতীয় রকমের ভাষা—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা আর কিছুতেই মনের মত কায়দা করে' উঠ্‌তে পারিনে—তখন মাথার চতুর্দ্দিক হতে রাজ্যের বাঙ্গলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মত মুখদ্বারে ভিড় করে' ছুটে আসে। ভাব্‌লুম এত উতলা হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরিজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভাল হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমত ভাবটা ইংরাজিতে রচনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

কথাটা ঠিক বটে মশায়! পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুল্‌লে অত্যন্ত অসুবিধে হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম থপ্‌ করে' তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি!

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল সেটা একটা

প্রাকৃতিক সত্য—সে আর আমাদের অস্বীকার করবার যো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান!

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্ব্বের বিষয়, যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হয়!

তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোন শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাক্‌তেও পারে। কিন্তু যখন একজন অস্থিজর্জ্জর অর্দ্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে' ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কি দেখা যাক্! ভোরের বেলা আহার করে' বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আরো দুটো পয়সা বেশি উপার্জ্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু'চার আনায় বিক্রয় করেচে। নিতান্ত গরীব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়সাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করেনি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বল্‌তেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মত বসে' বসে' পাখা টান্‌তে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আস্‌বেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য র…
পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি…